প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা : উত্তরবঙ্গের সাধারণ রূপরেখা

ক. উত্তরবঙ্গের সংজ্ঞা : 'উত্তরবঙ্গ' বলতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তরদিনাজপুর, দক্ষিণদিনাজপুর ও মালদহ—এই ছ'টি জেলার সমষ্টিকে সাধারণভাবে বুঝানো হয়। কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে এই ছ'টি জেলার পরিচয় হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের "জলপাইগুড়ি বিভাগ"।

ভারতের জাতীয় মানচিত্রে 'উত্তরবঙ্গ' নামে কোন ভূখন্ডের উল্লেখ নেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও কোনো রাজনৈতিক সীমা নির্ধারিত হয়নি 'উত্তরবঙ্গ' ও 'দক্ষিণবঙ্গ' নামে। 'জলপাইগুড়ি বিভাগ' সীমিত ভাবেই সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয় কিন্তু সাধারণ ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে এটি 'উত্তরবঙ্গ' বলেই স্বীকৃত। বাংলায় 'উত্তরবঙ্গ' এবং ইংরেজীতে 'নর্থবেঙ্গল' বলা হয়। "বৃটিশ আমল থেকেই এ আঞ্চলিকতাবাচক 'উত্তরবঙ্গ'/'নর্থবেঙ্গল' অভিধাটি লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে, এবং লোকের মনে এই প্রথানুগত্য এত প্রবল যে দেশ বিভাগের পর যখন গোটা রাজ্যটিরই নাম দাঁড়াল পশ্চিমবঙ্গ/ওয়েস্ট বেঙ্গল, তখনও উত্তরবঙ্গ/নর্থবেঙ্গল নামটি অব্যাহত রয়ে গেল লোকের মুখে মুখে, শুধু মুখে মুখেই নয়, দেশ বিভাগের পর 'উত্তরবঙ্গ' ট্রেনের নাম হল নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারী পরিবহন সংস্থার নাম হল 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা';এই সমস্ত নামই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারিত। এইসব প্রাতিষ্ঠানিক নাম থেকে বোঝা যায় উত্তরবঙ্গ/নর্থবেঙ্গল নামটির কোনও আনুষ্ঠানিক তথা প্রশাসনিক স্বীকৃতি না থাকলেও এই নাম সম্পর্কে জনগণের মৌখিক প্রথানুগত্যকে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। তাছাড়া,সাহিত্যে,সাংবাদিকতায় এবং বানিজ্যিক বিজ্ঞাপণে'উত্তরবঙ্গ' শব্দটি আজ লিখিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।" (১)

বর্তমান উত্তরবঙ্গের সীমা হল – উত্তরে সিকিম রাজ্য ও ভূটান পার্বত্য রাষ্ট্র; দক্ষিণে বাংলাদেশ ও গঙ্গা নদী; পূর্বে বাংলাদেশ ও আসাম রাজ্য; পশ্চিমে বিহার রাজ্য ও নেপাল রাষ্ট্র। উত্তরবঙ্গের আয়তন ২১,৬২৫ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের এক তৃতীয়াংশ। উত্তরবঙ্গের লোকসংখ্যা হ'ল১,২৩,৩৬,২৯২ জন (১৯৯১)।

খ উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস :

বর্তমান উত্তরবঙ্গ কোচবিহার জেলা বাদে আগে 'পৌন্ড্রদেশ' নামে অভিহিত হত। পুন্ড্রবর্ধন বা পৌন্ড্রদেশ (কোচবিহার বাদে উত্তরবঙ্গ), সমতট অধুনা বাংলাদেশের খুলনা,যশোহর,নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা,ফরিদপুর, (ঢাকা) জেলা নিয়ে গঠিত), তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক – মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল), কামলঙ্কা (বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা), কর্ণ সুবর্ণ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল), হরিকেলা (চন্দ্রদীপ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ জেলার সমষ্টি) ও বাকলা (বাংলাদেশের বরিশাল জেলা) - এই সাতটি প্রধান রাজ্য নিয়ে তৎকালীন বঙ্গদেশ গঠিত ছিল। কিন্তু এতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেন হুয়েন সাং-এর ভারত আগমনের সময় বঙ্গদেশ পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল—পৌন্ড্র বা উত্তরবঙ্গ, কামরূপ বা আসাম, সমতট বা পূর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল এবং দক্ষিণ সমুদ্র - উপকূলস্থ তাম্রলিপ্ত। (২)

মুসলমান শাসনকালে বৃহত্তর বঙ্গদেশকে 'সুবেবঙ্গাল' বলে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল। পাল ও সেন রাজাদের আমলে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌন্ড্রভুক্তি নামে পরিচিত হয়েছিল এই পুন্ড্রবর্ধন অঞ্চলটি। "ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুন্ড্র পঞ্চম - ষষ্ঠ শতকে পুন্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং গুপ্ত রাষ্ট্রের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হইয়াছে।" (৩)

ঐতিহাসিকদের মতে মালদহের পান্ডুয়াই প্রাচীন পুন্ড্র দেশ বা পুন্ড্র বর্ধন। ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জণ রায় বলেন " করতোয়া মধ্যবর্তী ভূভাগই তাহা হইলে পুন্ড্রবর্ধন"। (৩) আনুমানিক ৬০০ :— ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড় ছিল তার রাজধানী। শশাঙ্কের পর পাল রাজারা গৌড় শাসন করেন (আনুমানিক ৭৫০ - ১১৬০ খৃঃ)। পালদের পর সেনবংশ রাজত্ব করেন (আঃ ১০৯৫ - ১২৫০ খৃঃ)। সেন বংশের পর মুসলমান আধিপত্যের সূচনা হয়।

দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার পাল রাজাদের রাজত্বকালে কোচ সম্প্রদায় শক্তিসঞ্চয় করে। এই সময়ে কামরূপ অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দেয় এবং ক্ষমতা লড়াইয়ে বিভিন্ন উপজাতিয়রা নেমে পড়ে। পরে কামরূপের পূর্বাঞ্চলেআহোমরা আধিপত্য বিস্তার করে। নীলধ্বজ ধরলা নদীর পশ্চিম পাড়ে কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন করে। " খেন বংশের রাজারাই কামরূপ থেকে রত্নপীঠকে পৃথক করে কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।" (৪) খেন রাজাদের শেষ রাজা ছিলেন নীলাম্বর। তাঁর রাজ্যের পরিধি ছিল গোয়ালপাড়া ও কামরূপের পশ্চিমাঞ্চল, রংপুর ও কোচবিহারের সম্পূর্ণ অংশ, জলপাইগুড়ি ও অবিভক্ত দিনাজপুরের কিছু অংশ। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা নদীয়া দখল করলে বাংলার শাসনভার মুসলমান শাসকদের হাতে চলে যায়। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসক হুসেন শাহ কামতাপুর আক্রমন করেন, ১৪৯৮ খৃঃ নীলাম্বরকে বন্দী করে কামতাপুর দখল করেন। এরপর পুত্র নসরৎ শাহের হাতে কামতাপুরের শাসনভার অর্পণ করেন। আহোমদের কাছে নসরৎ শাহ পরাজিত হলে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পাড়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে আবার অরাজকতা সৃষ্টি হয়। (৫)

বঙ্গদেশে বারভুঁইঞারা যখন মোগল আধিপত্য অস্বীকার করে সেই সময় ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ে কোচ-প্রধান হাজোমন্ডল ক্ষমতাশালী হয়। এই হাজোমন্ডল তার দুই মেয়ে জিরা ও হীরার বিয়ে দেন সরলভাঙ্গা ও চম্পাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী চিকনা পাহাড়েরমেচ প্রধান হৈহয় বংশীয় হারিয়া বা হরিদাস মন্ডলের সঙ্গে। কিন্তু হাজো সম্পর্কে চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন — " Hajo was an area of land in Kamrup comprising of Goalpara, Dhubri and part of Gauhati. Hari das was the Sardar of Hajo".(৬) ডঃ সুনিতী কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর কিরাত - জন - কৃতি গ্রন্থে একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন " A Single Koch kingdom was split up in to two Koch States of Hajo in Goalpara (Assam) and Koch Behar in North Bengal". (৭)

যাই হোক হরিদাস মন্ডলের ঔরসে জিরার গর্ভে চন্দন ও মদন এবং হীরার গর্ভে শিশ্ব ও বিশ্ব নামে চার পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ১৫১০ খৃঃ চন্দন চিকিনার শাসক হয়। (৭) কিন্তু এই সম্পর্কে অর্থ্যাৎ কোচরাজা হিসেবে চন্দনের নাম কোন নথিপত্রে পাওয়া যায়না। (৮) ১৫২২ খৃঃ বিশু বা বিশ্বসিংহ কামতাপুরের শাসক হন। ভ্রাতা শিশ্বসিংহ অনুজের অনুকূলে সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করে নিজেই রাজছত্র ধারণ করেন এবং 'রায়কত' উপাধী ধারণ করে বংশানুক্রমিক প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। (৯)

বিশ্বসিংহ সাম্রাজ্য বিস্তার করে বৈকুন্ঠ পুরের শাসনভার অগ্রজ শিশ্বসিংহকে অর্পণ করেন। শিশ্বসিংহের রাজধানী স্থাপিত হয় দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার ডাবগ্রামে; এর নাম হয় নিজ বৈকুন্ঠপুর। বৈকুন্ঠপুরের রাজারা কামতাপুরের মহারাজকে বার্ষিক নজরানা দিতেন এবং অভিষেকের সময় রাজছত্র ধারণ করতেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে থেকে বৈকুন্ঠপুরের রাজা মহীদেব কামতাপুর বা কোচবিহারের রাজাকে নজরানা দিতে এবং রাজছত্র ধারণ করতে অস্বীকার করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে (১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ - ১৮০০ খৃষ্টাব্দ) জয়ন্ত দেব জলপাইগুড়িতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভুটান চুক্তির সময় বৈকুন্ঠপুরের রাজাদের জমিদার হিসেবে ঘোষনা করেন।" Thus the independent estate ended with Darpa Dev the 12th ruler in 1774 A.D., after the reign of 230 years and the Jamindari was abolished in 1955 A.D. after 180 years, under the Bengal Estate acquisition Act of 1954 A.D."(১০) ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে

বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হয়।

১৫১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৭৩ খৃঃ পর্যন্ত কোচবিহারের রাজারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করে সামন্ততান্ত্রিক করদমিত্র রাজ্যে পরিনত হয় কোচবিহার। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে কোচবিহার ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগ দেয়। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিনাজপুর জেলার পত্তন করে। ১৪১৪ -১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা গনেশ মুসলমানদের হাত থেকে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা গণেশের উপাধি 'দনুজমর্দনদেব' থেকেই দিনাজপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ১৯৪৭ সালে মাত্র তিনটি মহকুমা নিয়ে এই জেলার পত্তন হয় এবং ১৯৫৬ খৃঃ বিহারের পুর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ, গোয়ালপোখর ও ইসলামপুর থানাকে এই জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল এই জেলাকে দুটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে - উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ইংরেজ রাজত্বকালে মালদহ জেলার পত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে এই জেলার পাঁচটি থানা পাকিস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

গ. উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় :

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক রূপরেখা বৈচিত্র্যময়। পাহাড় ও সমতলের বৈচিত্র্য, অরণ্য ও শস্যক্ষেত্রের সহাবস্থান, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা, শৈত্য ও উষ্ণতার সম্মিলন ইত্যাদি উত্তরবঙ্গে বৈচিত্র্য এনেছে।

উত্তরবঙ্গের উত্তরের তিনটি জেলা—দার্জিলিং ৩,০৭৫ বর্গকিলোমিটার),জলপাইগুড়ি (৬,২৪৫ বর্গকিলোমিটার) এবং কোচবিহার (৩,৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার)— পুর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। এদের মধ্যে দার্জিলিং জেলাটি পার্বত্য অঞ্চল, কেবল শিলিগুড়ি মহকুমাটি দক্ষিণের তরাই সমভুমিতে অবস্থিত। বাকী তিনটি জেলা উত্তর দিনাজপুর (৩৩০৬ বর্গ কিলোমিটার) দক্ষিণ দিনাজপুর (২০০০ বর্গ কিলোমিটার) এবং মালদহ (৩৭১৩ বর্গ কিলোমিটার) ত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত এবং শীর্ণাকৃতি।

দার্জিলিং জেলার উত্তরাংশ হিমালয়ের গিরিশ্রেণী ও উপত্যকা নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলটি দক্ষিণ থেকেউত্তরে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গেছে। সিকিম থেকে তিস্তা নদী উৎপন্ন হয়ে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে অঞ্চলটিকে দুভাগে ভাগ করেছে। শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে পুরো দার্জিলিং জেলাটি পর্বত্য অঞ্চল।

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব ও উত্তরাংশ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশ ১০০ মিঃ সমোন্নতি রেখায় অবস্থিত অঞ্চলটি হল তরাই অঞ্চল। পুর্ব হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি থেকে প্রবাহিত মহানন্দা, তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, রায়ডাক প্রভৃতি নদী-বাহিত পলি,বালি ও নুড়ি জলে তরাই অঞ্চলটি সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে তিস্তা নদীর ডান দিকের অংশ তরাই এবং বাঁ দিকের অংশ ডুয়ার্স নামে পরিচিত। তরাই অঞ্চলটির উপর দিয়ে মেচি, বালাসন, মহানন্দা, তিস্তা, লিস, ঘিস, মূর্তি, জলঢাকা, ডায়না, মজনু, তোরষা, ভিমা, চেকো, কালজানি, রায়ডাক প্রভৃতি নদী দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ঠ বলে সারা বছর জল থাকে ; অন্য নদীগুলো বর্ষার জলে পুষ্ট বলে গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকিয়ে যায়।

তরাই অঞ্চলের দক্ষিণে গঙ্গা নদীর বাম তীর পর্যন্ত উত্তরের সমভূমি অঞ্চল বিস্তৃত। জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশ, উত্তরের সামান্য অংশ বাদে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার ও মালদহ জেলা উত্তরের সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত।

এই অঞ্চলে তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক পূর্ববাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে; মহানন্দা, নাগর, কালিন্দী, টাঙ্গন, পূনর্ভবা, আত্রাই সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে গঙ্গা বা পদ্মায় মিলিত হয়েছে।

তরাই অঞ্চলের মাটির উর্বরতা কম। কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার কালিন্দী নদীর পুর্বভাগের জমি অত্যন্ত উর্বর। মালদহ জেলার পূবাংশ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঢেউ খেলানো উচু নীচুঅঞ্চল বরেন্দ্রভুমি, এর উর্বরতা অনেক কম। মালদহ জেলার কালিন্দী নদীর দক্ষিণাংশ দিয়ারা নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি অত্যন্ত উর্বর।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার—এই তিনটি জেলায় বার্ষিক গড় উত্তাপ ৮° - ৩০° সেঃ এবং বৃষ্টিপাত গড় ২০০ - ২৫০ সেমিঃ। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ জেলার বার্ষিক গড় উত্তাপ ১০° - ৩৫° সেঃ এবং বৃষ্টিপাত ১৭৫ - ২০০ সেমিঃ। বর্ষাকালে মৌসুমী আর্দ্র জলবায়ু দেখা যায় এবং শীতকালে শুষ্ক জলবায়ু দেখা যায়। শীতকালে দার্জিলিংএ প্রায়ই বরফ পড়ে। (১১)

ঘ. উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ১,২০,৩৬,২৯২ জন। জেলা ভিত্তিক এই জনবিন্যাস হল —

জেলা	মোট জনসংখ্যা	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি
কোচবিহার	২১৭১১৪৫	১১২৩৭১৯	১৩২৭৫
জলপাইগুড়ি	২৮০০৫৪৩	১০৩৫৮১৪	৫৮৮৯৩৮
দার্জিলিং	১২৯৯৯১৯	২০৯৮৭৬	১৭৯১৫৩
উঃ দিনাজপুর	১৯২৬৭২৯	৫৫৪০৯১	১০৪৩১২
দঃ দিনাজপুর	১২০০৯২৪	৩[illegible]৪৬২	২০৩১৭৫
মাল[illegible]	২৬৩৭০৩২	৪[illegible]৮৯৬	১৭১৬[illegible]

১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুসারে উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৭৪,১৮,৬৬৩ জন এবং মোট জনসংখ্যার মধ্যে তপশিলী জাতির সংখ্যা ২০০৭৭৭৩ জন এবং তপশিলী উপজাতির সংখ্যা ৮,৯৯,৮২৪ জন। এই তপশিলী জাতির মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ হচ্ছে রাজবংশী (উঃ ও দঃ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার) ও পলিয়া (জলপাইগুড়ি , মালদহ ,উঃ ও দঃ দিনাজপুর,) এবং সংখ্যালঘু হচ্ছে বেলদার (মালদহ, উঃ ও দঃ দিনাজপুর), ভূইমালি (মালদহ, উঃ ও দঃ দিনাজপুর), দোয়াদ (জলপাইগুড়ি মালদহ ,উঃ ও দঃ দিনাজপুর), গোঁড়ি (মালদহ ,উঃ ও দঃ দিনাজপুর), মাল (জলপাইগুড়ি , দার্জিলিং, কোচবিহার), মূলাহার (মালদহ ,উঃ ও দঃ দিনাজপুর), নুনিয়া (মালদহ ,উঃ ও দঃ দিনাজপুর), তিয়ার (মালদহ, দার্জিলিং)।" নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এই সব তপশিলী জাতি উপজাতির উদ্ভবগত পরিচয় যাই হোক না কেন, এঁরা এখন সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বাঙালী ও ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু বা হিন্দুপ্রবণ, এবং এঁদের মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা বাংলা।" (১২)

উত্তরবঙ্গের তপশিলী উপজাতির মধ্যে দুটি ধারা প্রধান—(১) মঙ্গোলীয়, (২) আদি - অস্ট্রাল। এরা মুখ্যত উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলেই উপনিবিষ্ট।

(১) মঙ্গোলীয়—ভুটিয়া, লেপচা, রাভা, মেচ, গারো, টোটো।

(২) আদি - অস্ট্রাল - মুন্ডা, নাগোসিয়া, সাঁওতাল, মাহালি, কোরা।

দ্রাবিড়, গোষ্ঠীর দু'টি উপজাতি উত্তরবঙ্গে আছে—ওরাওঁ এবং মালপাহাড়িয়া। এই দুটি উপজাতি সাধারণত সাদরী ও বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এঁরা কেবল উত্তরবঙ্গে নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গেই মিশ্রিত সাদরী ভাষা বা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। (১৩)

তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাড়া উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ আছে বাঙালী ও অবাঙালী বর্ণহিন্দু ও মুসলমান। বাঙালী বর্ণহিন্দুদের একটা অংশ উত্তরবঙ্গে চা - শিল্পের বিস্তার সূত্রে গত শতকের শেষ থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে

উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট হতে থাকেন। দেশ বিভাগের পর বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকার মত উত্তরবঙ্গেও পূর্বপাকিস্থান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে বাঙালী উদ্বাস্তু আসে। আসামে উপনিবিষ্ট অনেক বাঙালীও আসামের বিদেশী তাড়াও আন্দোলনের শিকার হয়ে উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস করতে থাকে।

উত্তরবঙ্গে নগরায়ন কম হওয়ায় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার মৌল কাঠামোর তেমন পরিবর্তন ঘটে নি। তবু দেখা যায় স্থানীয় এলাকার জীবনধারার চিরাচরিত ঐতিহ্যের সঙ্গে উপনিবেশের জীবনধারার অর্থ্যৎ বাইরে থেকে আসা মানুষের জীবনধারার সহাবস্থান বা কোথাও মিশ্রণ ঘটেছে। উত্তরবঙ্গে ভাষিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে একথা মনে রাখতে হবে দীর্ঘদিন একসঙ্গে বসবাস করলে পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতির বহুল পরিবর্তন হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের জনসমষ্টির মধ্যে ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেখা যায় রাজবংশী সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ। রাজবংশীদের সংখ্যা ছিল দার্জিলিং জেলায় ১৫,৮৯৪ জন, জলপাইগুড়ি জেলায় ১,৭২,৭১০ জন, কোচবিহার জেলায় ২,৫২,০৬৯ জন, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৬৭,৪৮৯ জন। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০,০৪৪ জন পলিয়া এবং ১৪২১ জন তিয়র জাতির লোক ছিল। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজের সমাজ ও সংস্কৃতি রাজবংশীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই রাজবংশী সংস্কৃতিই উত্তরবঙ্গের মূল সংস্কৃতির প্রবাহ। স্বাধীনতার পর বহু উদ্বাস্তু এসে উত্তরবঙ্গে বসতি শুরু করে; এর ফলে উত্তরবঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।

ঙ. উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের আর্থসামাজিক স্বরূপ :

উত্তরবঙ্গের জনসমাজের আর্থসামাজিক কাঠামোটি এখনও কৃষিভিত্তিক ও গ্রামীণ। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার চা-বাগান এলাকা বাদ দিলে সারা উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি কৃষিপণ্যের উপর নির্ভরশীল।

বর্তমানকালে উত্তরবঙ্গে মূলত দুটি জনগোষ্ঠীরই প্রাধান্য; প্রথমতঃ রাজবংশী এবং দ্বিতীয়তঃ অন্য জনগোষ্ঠী। অন্য জনগোষ্ঠী বলতে বোঝায় ভারত ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গথেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালী জাতি। চা-বাগান এলাকায় বৃটিশ আমলেই বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আগত আদিবাসীরা স্থায়ী বসবাস করছে। তাই দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের সার্বিক জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা রাজবংশীদের প্রাধান্য। অন্যান্য প্রাচীন উপজাতীয় মানুষ নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে প্রান্তিক গতিতে চলবার চেষ্টা করছে।

সাধারণতঃ রাজবংশীরা কৃষিজীবি। তবে অনেকেরই নিজস্ব জমি নেই। কৃষিকাজ ছাড়া অনেকে মাছ ধরা, কাপড় বোনা, সুতোকাটা ইত্যাদি কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতেন।

স্বাধীনোত্তর যুগে উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্ববঙ্গথেকে আগত উদ্বাস্তুদের অনেকেই রাজবংশীদের কাজের পাশাপাশি সব কাজই করছে। কৃষিকাজ, মৎস চাষ, মাছ ধরা, তাঁত বোনা, নানা ধরনের কামলা- কিষাণের কাজ ইত্যাদি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা করতে দ্বিধা করছেন না। যান্ত্রিকবিকাশের ফলে কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ ঘটছে; পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়নের ফলে কৃষকরা উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, ব্যাঙ্ক থেকে কৃষিঋণ ইত্যাদির সুবিধা পাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শাসন প্রচলনের পর বর্গা - অপারেশন করে কৃষকের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়। গ্রাম - গ্রামান্তরে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও বিস্তার ঘটায় যানবাহনের চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে, এর ফলে কৃষিপণ্যের চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। এই যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যাবস্থার উন্নয়ন ও বিস্তার হওয়ায় গ্রামীন মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসারতা বেড়েছে, ব্যবসা - বানিজ্য ও চাকুরী ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার প্রবণতাও বেড়েছে। সংরক্ষণ আইন এবং শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে গ্রামীণ মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে—স্বাধীনতাপূর্ব মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার স্থবির মানসিকতা বর্জিত হয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। গ্রাম ও শহরে সর্বস্তরে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন হলেও এই পরিবর্তনের গতি উত্তরবঙ্গে অত্যন্ত শ্লথ। তাই ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামগুলোতে দেখেছি এখনও প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা আপন বেগে প্রবহমান।

উত্তরবঙ্গের লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি :

ঐতিহাসিক নানা কারণে এক সময় উত্তরবঙ্গ প্রাচীন জনপদরূপে চিহ্নিত হয়েছিল, কিন্তু গৌড় সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের পর এই অঞ্চল বৃহত্তর বঙ্গ ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল; আবার ইংরেজ রাজত্বকালে এই বিচ্ছিন্নতা বিদূরিত হয়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়।

প্রাচীন উত্তরবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা। দেশী - পলি ও কোচরাও এই জনগোষ্ঠীর অংশ বলা হয়ে থাকে। "The Koch, Rajbanshi and Poliya are for the most part one and the same tribe".(১৪)

প্রাক স্বাধীনতাকালে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উঃ ও দঃ দিনাজপুর জেলায় রাজবংশীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বাধীনোত্তর কালে কোচবিহারে শুধু এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাচক - গোষ্ঠীর ভাষা হল "কামরূপী বাংলা"। অন্যান্য সম্প্রদায় বা জাতি উপজাতীয় লোকের নিজেদের ভাষা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা বাড়ীতে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় সর্বদা শিষ্ট চলিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এর শিলিগুড়ি মহকুমা, উঃ ও দঃ দিনাজপুর জেলায় ' কামরূপী বাংলা' লোকভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়; মালদহে সাধারণ ভাবে বরেন্দ্রী বাংলা উপভাষা প্রচলিত। এছাড়া মালদহে ' মুসলমানী বাংলা' ও 'খোট্টা'ভাষা, উত্তর দিনাজপুরে ' সুর্যাপুরী ' এবং দঃ দিনাজপুরে যে,'কোটীবর্ষী' উপভাষা কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। এইসব উপভাষাভাষীদের কাছে বর্তমানে রাঢ়ী - আশ্রিত - চলিত বাংলা ভাষা মর্যাদার আসন লাভ করেছে। এর কারণ বলাযায়, শিক্ষার প্রসার, ষাটের দশক থেকে প্রতিরক্ষা বিভাগের তৎপরতা, ফারাক্কা সেতু নির্মিত হওয়ায় স্থলপরিবহনের সুবিধা, ব্যবসা - বানিজ্য ও চাকুরীর সম্প্রসারিত সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের রাঢ়ী - ভাষী লোকদের আনাগোনা বেড়েছে; তাছাড়া রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদির প্রচলন বেড়েছে। তবে রাঢ়ী - আশ্রিত - চলিত বাংলা ভাষা মূল্য পেলেও এর ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের কিছু বিচ্যুতি ও মিশ্রণ দেখা দিয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজাদের ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, ইসলাম ধর্মের প্রভাব পড়ে। বৈষ্ণব ধর্মও সমগ্র উত্তরবঙ্গকে প্রভাবিত করেছিল চৈতন্যদেব ও শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের প্রভাবে। বিভিন্ন আদিবাসী জাতি উপজাতি তাদের লোকাচার ও লোকধর্মের সঙ্গে নানা ধর্মের দেবদেবীর আরাধনা করেছে এবং বহু লোকায়ত দেব-দেবীরও উদ্ভব ঘটেছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে শিব সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিপালন উত্তরবঙ্গের লোকজীবনকে যেভাবে আপ্লুত রেখেছিল তার প্রকাশ এখানকার লোক-সংস্কৃতি, লোকধর্ম ও নানা লোকাচারের মধ্যে দেখা যায়। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় শিব হয়েছেন কৃষির দেবতা, আবার সুজলা সুফলা করবার জন্য নদীমাতৃক দেশে নদীকেও দেবতাজ্ঞানে পূজোর প্রচলন হয়, বৃষ্টির জন্য 'হুদুম দ্যাও' পূজোও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার প্রসার যে সমাজে হয়নি সেখানে বিজ্ঞান ভিত্তিক লোকবিশ্বাস গড়ে ওঠেনা। তাই উত্তরবঙ্গে দেখা যায় বিভিন্ন জাতি-উপজাতীয় লোকেরা নিজস্ব 'কৌম' অনুযায়ী লোকাচার পালন করে থাকে। উত্তরবঙ্গে বহু ব্রতকথা প্রচলিত রয়েছে; যেমন,যাইটোল পূজো, হুদুম দ্যাওপূজো, কাতি পূজো, শুবচনী ব্রত, ধড়ম ঠাকুর পূজো-এগুলো লৌকিক ব্রত। ধর্মীয় ব্রত ও প্রচলিত হয়েছে; যেমন, কাত্যায়নী ব্রত। " উত্তরবাংলার ব্রতকথা গুলি দক্ষিণ বাংলার ব্রতকথার মতো শুধু কথা নির্ভর নয়। ..... সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ব্রতকথার অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়।" (১৫) তিস্তাবুড়ী পূজো বা মেচেনী খেলা বা ভেদেই খেলা জলপাইগুড়ির মেচ সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচলিত। বিষহরি বা মনসা পূজো, রোয়াগাড়া (ওয়াগড়া), বাস্তুপূজো বা ধত্তি পূজো, ভান্ডানী পূজো, নিতুয়া দেবী পূজো, মাশান পূজো, কৃষিকে কেন্দ্র করে ফসল বোনা এবং কাটার সময় বিভিন্ন পূজো হয়ে থাকে।

প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নানা লোকশিল্পেরও সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাত্যহিক জীবন নির্বাহ করতে যে সকল দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন সেসব নিজেরাই ঘরে বসে বাঁশ, বেত, কাঠ দিয়ে বানিয়ে নিত। ফলে সেগুলোর মধ্যে শৈল্পিক মানসিকতার

ছাপ ফুটে উঠত। যেমন বাঁশের তৈরী মাছ মারার নানা রকম যন্ত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরী নানা সামগ্রী, বাদ্য যন্ত্র ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের লোকশিল্পের সুদৃশ্য নিদর্শন আজও দেখা যায়।

জীবনকে মধুময় করে তুলবার প্রচেষ্টায় শিক্ষার উজ্জ্বল বর্তিকার সন্ধান না পেলেও উত্তরবঙ্গের জনজীবনে লোক-সংগীত ও লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, মরিশুরিয়া, কীর্তন ইত্যাদির সুর জনজীবনকে আপ্লুত করে রেখেছিল। তাছাড়া নানা প্রকার ছড়া, লোককথা, প্রবাদ প্রবচনে জনমানসের ঔৎকর্ষ প্রতিভাত হয়েছিল। লোকনাটক উত্তরবঙ্গের লোক-সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল; লোকনাটক যেমন আনন্দদেয়, তেমনি সমাজকে দেয় শিক্ষা। তাই উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় এই লোকনাটক লোকমানসে আনন্দ ধারা প্রবাহিত করে তাদের জীবনকে সগতিক করে রেখেছিল।

কালপ্রবাহে উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভাষিক রূপ, সাংস্কৃতিক রূপের নানা পরিবর্তন এসেছে; এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যাবেনা; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তনই স্বাভাবিক। তাই দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের সার্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য লোকজীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এই সব লোক-সংস্কৃতির স্বরূপ ও চিহ্ন সংরক্ষিত নাহলে সভ্যতার দূরন্ত প্রবাহে এই অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস ও প্রগতি ধরে রাখা যাবেনা।

তথ্য সুত্র :-

১) ডঃ নির্মল দাশ — উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ (২য় সং - ১৯৯৭)। পৃঃ-২

২) Dr. R.C.Dutt - A brief History of Ancient and Modern India. (1962). P-43.

৩) ডঃ নীহার রঞ্জন রায়— বাঙালীর ইতিহাস; আদিপর্ব (১৩৫৬)। পৃঃ-১৫৪

৪) কোচবিহার গ্রন্থ প্রকাশন প্রস্তুতি কমিটি— কোচবিহার পরিক্রমা; প্রথম অধ্যায়; (১৯৮৪)। পৃঃ-২৪৫)

৫) Harendra Narayan Chowdhury - The Cooch Behar States and its Land Revenue Settlements 1903. P - 224.

৬) Charuchandra Sanyal - The Rajbanshis of North Bengal (1965) P-5

৭) Dr. Sunity Kumar Chatterjee - Kirata-Jana-Kriti (1951). P-65.

৮) খান চৌধুরী আমানাতুল্লা আহ্‌মেদ — কোচবিহারের ইতিহাস; প্রথম খন্ড। (১৯৩৬)। পৃঃ ৮৪

৯) কোচবিহার পরিক্রমা (২য় অধ্যায়)। (১৯৮৪) পৃঃ ১২

১০) Charuchandra Sanyal - The Rajbanshis of North Bengal (1965) P-8.

১১) বসু ও মৌলিক — মাধ্যমিক ভূগোল (১৫ সং,১৯৯৬) পৃঃ — (পরিশিষ্ঠ -১) ৬-৯;১৯-২২ পৃঃ

১২) ডঃ নির্মল দাশ - উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ (২য় সং) (১৯৯৭) পৃঃ -৩

১৩) Handbook of Scheduled Castes & Scheduled Tribes of West Bengal. Special Series No. 8. P- 140 "
"Most of them in this state speak either the corrupt form of Bengali or in Sadri Dilect which is a mixed form of Bengali and other languages".

১৪) Baverly, H. - Census report of Bengal (1872), Vol -1 page 130.

১৫) হরিশ চন্দ্র পাল — উত্তরবাংলার লৌকিক ব্রতকথা। (১৯৮০) পৃঃ - ৬